১-১৩

রোকেয়া নামা

সাজিদ হাসান

পিডিএফঃ নাসিম আহমাদ

রোকেয়া নামা • পর্ব ১

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। বাঙালি শিক্ষিত সমাজে 'মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে যাকে ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আরম্ভ করে ১৯৩২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যার অধিকাংশ লেখা শিক্ষিত মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে বেশ আলোচিত-সমালোচিত ছিল। এমনকি একশো বছর পেরিয়ে আজও যিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি স্কুল-মাদ্রাসায় ছোট ছোট কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যবইতে তাকে মহান মহীয়সী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

বেগম রোকেয়া যে তিনটি কারণে সবচে বেশী আলোচিত ব্যক্তিত্ব, সেগুলো হলোঃ

১. নারী অধিকার' প্রতিষ্ঠায় তার লেখনী।

২. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা, তথা নারীশিক্ষার পক্ষে তার সামাজিক প্রচেষ্টা।

৩. তার সাহিত্য কর্ম।

ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে তাদের অনুগত শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ সদস্য (মুসলিম, অমুসলিম দুই সম্প্রদায়ই) বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কর্ম, নারী জাগরণের আহ্বানের অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। তার প্রতি অতীত ও বর্তমান এলিট ক্লাসের সম্মানের আতিশয্যে ভ্রম হয়, বেগম রোকেয়া ছিলেন মুসলিম নারীদের রক্ষার জন্য আসমান থেকে নাযিল হওয়া 'ঐশী দূত', যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিম নারীদেরকে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের যুলুমের বেড়াজাল থেকে রক্ষা করা। তবে, বেগম রোকেয়ার সামগ্রিক সাহিত্য পড়লে ধারণা হয়, ইসলামের কওল বা

বক্তব্য, পুরুষ ও আলিমদের সঙ্গে তার নারীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে বেশ মতপার্থক্য ছিল। তাই, ইসলাম, পুরুষ ও আলিমদের প্রতি বেশ চাপা একটা ক্ষোভও রোকেয়ার লেখনীতে বেশ স্পষ্ট। যাক সে কথা।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য, নারীদের অবস্থার ‘উন্নয়নে’ তার চেষ্টা, উপনিবেশের অধীনে থাকা তৎকালীন বাঙালি সমাজ থেকে শুরু করে আজ অব্দি স্বাধীন বাংলাদেশের অসংখ্য নারীদের জীবনে তার ‘সামাজিক’ কর্মকাণ্ডের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার আগে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলো আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। তাহলে তৎকালীন সমাজ কিংবা এক শতাব্দী পর এসে আজকেও বেগম রোকেয়ার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু—সেটা বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৮৮০ সাল) রংপুরের এক ধনাঢ্য মুসলিম বাবা-মায়ের ঘরে বেগম রোকেয়ার জন্ম। তার পিতার নাম জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু ১৯১৮)। তিনি ছিলেন ব্রিটিশদের অধীনস্থ একজন জমিদার। সিপাহি বিপ্লবের সময় জমিদার আলী সাবের ইংরেজ অথবা আইরিশ এক নারীকে বিয়ে করেন , যদিও তখন তার ঘরে স্ত্রী-সন্তান ছিল। আলী সাবের তার বড় দুই ছেলেকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করান।

রোকেয়ার বড়ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম ১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ওই বছরই কলকাতায় বড় বোন করিমুন্নেসার বাড়িতে থাকতে বেগম রোকেয়া সেখানে ইউরোপিয়ান গভর্নেসের কাছেও কিছুদিন পড়াশোনা করেন। প্রাথমিক জীবনে বড় দুই ভাই, বোন করিমুন্নেসা এবং মেম গভর্নেসের কাছে রোকেয়ার শিক্ষার সূচনা ঘটে।

১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৫৮-১৯০৯) সঙ্গে। অনেকেই মনে করেন, বেগম রোকেয়ার নারীদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার বিপ্লব সাখাওয়াত হোসেনের হাতেই হয়েছে। এখানে কিছু কথা জানিয়ে রাখা

প্রয়োজন। **বেগম রোকেয়ার সঙ্গে বিয়ের আগে সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮৫ সালে বিলেতে পড়াশোনা করতে যান। সেখানেই তিনি পশ্চিমা নারীদের সাথে মুসলিম নারীদের পর্দা ও অন্যান্য রীতিনীতির পার্থক্য স্বচক্ষে দেখতে পান।** ওই সময় ব্রিটেনে নারীদের ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকারর দাবীতে দীর্ঘ আন্দোলন চলমান ছিল। এসব কিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরে আসেন।

বিয়ের পর সাখাওয়াত হোসেন বেগম রোকেয়াকে যত্নের সঙ্গে ইংরেজি শেখান। বিহারের ভাগলপুরের সাখাওয়াত ছিলেন উর্দুভাষী, বাংলায় তার দখল অতটা ছিল না। এভাবেই করিমুন্নেসার কাছে বাংলা, ভাই ও স্বামীর কাছে ইংরেজির শিক্ষা পান তিনি। ফলে একই সঙ্গে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় তার দক্ষতা আসে। সে সময়ে মুসলিমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে নিন্দনীয় মনে করতো। তাই, রোকেয়ার পাঁচ ভাষা শিক্ষার এ সুযোগকে বেশ দুর্লভই বলা চলে।

বেগম রোকেয়া নিয়মিত ইংরেজি পত্রিকা ও বই পড়তেন। এসব সম্ভবত তার স্বামীর বদৌলতে তার হাতে পৌঁছুত। গ্যালিলিও, নিউটন, John Howard Payne, Marie Corelli সহ অতীত ও তৎকালীন অনেক জনপ্রিয়, অজনপ্রিয় ব্যক্তি ও সাহিত্যিকের কর্ম, সাহিত্যের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল। তার লেখায় বিজ্ঞানের তৎকালীন অনেক জটিল বিষয়েও লেখা পাওয়া যায়। যাতে বোঝা যায়, রোকেয়ার ইংরেজি পড়ার সীমা নিতান্ত কম ছিল না। বেগম রোকেয়ার অনেক প্রবন্ধের সঙ্গে পশ্চিমা অনেক সাহিত্যিকের মূলভাবের সাদৃশ্যও দেখা যায়। **তাই এ কথা বলা ভুল হবে না যে, নারীমুক্তির যে আদর্শ তিনি তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন, সে আদর্শের পরিচয় তিনি মূলত পশ্চিমা লেখকদের কাছ থেকেই লাভ করেন।**

বেগম রোকেয়া দুজন সন্তান জন্মদান করেছিলেন, দুজনই শৈশবে মৃত্যুবরণ করে। তাই আমৃত্যু তিনি নিঃসন্তান হিসেবেই জীবনযাপন করেন। ১৯০৯ সালে রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন মারা যান।

পাঁচ মাস পর রোকেয়া পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে বিহারের ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পারিবারিক সমস্যার কারণে ভাগলপুর ছেড়ে ১৯১১ সালে কলকাতায় একই নামে আবারো স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশায় বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রীর অভাবে স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান চালু করা সম্ভব হয়নি। শুরুতে শুধু উর্দু এবং পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে ইংরেজি ভাষায় পাঠদান আরম্ভ হয় ।

১৯৩২ সালে বেগম রোকেয়া কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। এ সময়ের মধ্যে **তিনি মতিচূর ১ম ও ২য় খণ্ড, পদ্মরাগ ও অবরোধ-বাসিনী—এ চারটি বই ছাড়াও অনেক প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা লিখেছেন।** যেগুলোর উল্লেখযোগ্য একটা অংশই তৎকালীন জনপ্রিয় সব পত্রিকায় ছাপা হয়।

রোকেয়া নামা • পর্ব ২

নিজের জীবদ্দশায় ভারত-বাংলার মুসলিম নারীদের প্রথম ও সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি বেগম রোকেয়া করেছেন, সেটি হল—**তিনিই এ অঞ্চলের মানুষদের সর্বপ্রথম ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের পথ দেখান। তার আগে সরাসরি এ জঘন্য কাজের আর কোন উদাহরণ সম্ভবত ভারতবাসী দেখেনি।**

১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, ইংরেজি মে ১৯০৩। ওই সময় বেগম রোকেয়ার বয়স সর্বোচ্চ ২৩ অথবা ২৪। **গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মহিলা' নামের পত্রিকায় তিন ধাপে রোকেয়ার 'অলংকার না badge of slavery' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।** এই প্রবন্ধতে বেগম রোকেয়া যেসব কথা লিখেছেন, সেগুলো থেকে বাছাইকৃত উদ্ধৃতিগুলো আপনাদের খেদমতে পেশ করছি—

এক. ***"দিদীমাদের মুখে শুনি যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত— তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে***

তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত রমণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একথার আমার সন্দেহ আছে। কারণ দিদীমাদের এ জ্ঞান পুরুষদের নিকট হইতে গৃহীত।"

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, *'আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'।*

এবং তিনি আদাম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।"

(সূরা বাকারা ৩০-৩১)

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তাথেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। যখন সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয় তখন সে লঘু গর্ভধারণ করে আর তা নিয়ে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারী হয়ে যায় তখন উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ডেকে বলে, 'যদি তুমি আমাদেরকে (গঠন ও স্বভাবে) ভাল সন্তান দান কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।"

(সূরা আরাফ-১৮৯)

কিন্তু বেগম রোকেয়া বলেন, তিনি এটি বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ, বেগম রোকেয়ার মতে, আল্লাহ যে আদম আঃ-কে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আদম আঃ-এর শান্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন

হাওয়া আঃ-কে, কুরআনের এই আয়াতগুলো পুরুষদের বানানো মিথ্যা গল্প।

রোকেয়া নামা • পর্ব ৩

‘অলংকার না badge of slavery’ প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া যেসব কথা লিখেছেন, সেসব থেকে বাছাইকৃত উদ্ধৃতিগুলো আপনাদের খেদমতে পেশ করছি

দুই. *“আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে “ঈশ্বরের আদেশপত্র” বলিয়া প্রচার করিয়াছেন... পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত কিংবা দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরুপ পয়গম্বরদিগকে (ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!”* [1]

অর্থাৎ, নারীদের প্রতারিত করতে পুরুষরা তাওরাত, ইঞ্জিল, কুরআনসহ সকল আসমানী কিতাবকে আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশগ্রন্থ বলে প্রচার করে। আদতে সেগুলো আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানি কিতাব নয়।

এবং, পয়গম্বর বা নবীরা মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত নয়। বরং তারা সবাই ছিল ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার। নিজেদের সময়কার অসভ্য বর্বর মানুষদের মধ্যে সবচাইতে চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন তারা। তাই কুটিল বুদ্ধি খাটিয়ে তারা নিজেদের পয়গম্বর বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন!

---

[1] রেফারেন্সঃ ‘অলংকার না badge of slavery’ প্রবন্ধ

বেগম রোকেয়ার মতে, এর প্রমাণ হল—যুগে যুগে মানুষ আগের যুগের মানুষদের চাইতে বেশী জ্ঞান অর্জন করেছে। তাই সেই সময়কার সবচে চতুর পয়গম্বর বা নবীদেরকেও সময়ের পরিক্রমায় আগের যুগের নবীদের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান দেখা গেছে (উদাহরণস্বরূপঃ তিনি বলতে চেয়েছেন, ইবরাহিম আঃ-এর সময়ের মানুষদের যে জ্ঞান ছিল, তার চাইতে পরবর্তী সময়ের ঈসা আঃ, মুহাম্মাদ সাঃ-এর আমলের মানুষদের জ্ঞান ছিল আরও বেশী। তাই, সমসাময়িক আপডেটেড জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের সময়কার অধিক জ্ঞানী মানুষদেরকেও বোকা বানাতে পেরেছেন। সেজন্যই দেখা যায়, ইবরাহিম আঃ-এর তুলনায় ঈসা আঃ, মুহাম্মাদ সাঃ অধিক জ্ঞানী)!

রোকেয়া নামা • পর্ব ৪

আমাদের ভালোবাসার রাসূল, পবিত্র কুমারী মাতার সন্তান, মুহাম্মাদ সাঃ-এর আগমনের সুসংবাদ দানকারী ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া বলেন,

“ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশী হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, “পয়গম্বর” বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন মহাত্মা ঈশা আপনাকে অবতারের অংশবিশেষ (ঈশ্বরপুত্র!) বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাহাতে লেখা হইল, “নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা—নারীর সম্পত্তিতে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার।” আর বুদ্ধি-বিবেকহীনা নারী তাই মানিয়া লইল।” [2]

বেগম রোকেয়ার দাবি, পৃথিবীতে আগত সকল নবীই ভণ্ডামি করে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে দাবি করেছে। একটা সময় পর ধোঁকা খেতে খেতে তাই মানুষ আর বোকা রইলো না।

---

[2] রেফারেন্সঃ রোকেয়া সমগ্র, অলংকার না Badge of slavery প্রবন্ধ

ফলে, কোন নবী নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করলে লোকে সে মিথ্যা দাবীতে বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিলো।

আর তাই, সুচতুর (!) ঈসা আঃ মানুষকে প্রতারিত করতে নিজের মর্যাদা (!) আরও এক ধাপ বাড়িয়ে নিলেন। সরাসরি নিজেকে আল্লাহর অংশ বলে দাবি করলেন। এরপর নিজে নিজেই ইঞ্জিল রচনা করলেন (অর্থাৎ, ঈসা আঃ আল্লাহর প্রেরিত দূত নয়। আর, ইঞ্জিল আল্লাহর প্রেরিত ঐশী কিতাব নয়)। [3]

ইঞ্জিল লেখার সময় তিনি সেখানে নারীদের শোষণ করতে অন্যায্য বিধান ঢুকিয়ে দিলেন। আর বুদ্ধি-বিবেকহীনা নারীরা ঈসা আঃ-এর সেসব মিথ্যাচার বিশ্বাস করে নিলেন!

রোকেয়া নামা • পর্ব ৫

আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া মন্তব্য করেন,

"তারপর মহাত্মা মহম্মদ আইন প্রস্তুত করিলেন যে, "রমণী সর্ব্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।" আর মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল।" [4]

আল্লাহ মাফ করুন। এটি সবচে মারাত্মক স্পর্ধার প্রকাশ। আর এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল (সা.)-এর উপর, ইসলামের বিধি-বিধানের উপর রোকেয়ার এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান ছিল না।

---

[3] রেফারেন্সঃ রোকেয়া সমগ্র, অলংকার না Badge of slavery প্রবন্ধ

[4] রেফারেন্সঃ রোকেয়া সমগ্র, অলংকার না Badge of slavery প্রবন্ধ

রোকেয়ার এই দাবিগুলো মেনে নিলে আপনাকে বলতে হবে,

- রাসূল সাঃ আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন না।
- যেহেতু তিনি আল্লাহর প্রেরিত কেউ নন, সেহেতু তিনি ভণ্ড, মিথ্যুক।
- তাঁর বলা কথা (অর্থাৎ হাদিস, শরিয়াহর বিধান) সব বানোয়াট।

(আস্তাগফিরুল্লাহ। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ মাফ করুন)

ইসলামের মৌলিক ইলম থাকার পরও উপরের কথাগুলোতে কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে সায় দিলে মুহূর্তের ব্যবধানে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন,বেগম রোকেয়ার চিন্তার ভয়াবহতা কোন পর্যায়ের?

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় (আয়াতঃ ৩৪) বলেন,

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবান স্ত্রীরা (আল্লাহ ও স্বামীর প্রতি) অনুগতা থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন...।"

আর বেগম রোকেয়ার মতে, নারী যে সবসময় পুরুষের—পিতা, ভাই, স্বামী অথবা সন্তান—নিরাপত্তার চাঁদরে সুরক্ষিত থাকবে, রাসূল ﷺ এই আইন নিজের মর্জি মতো বানিয়েছেন। এভাবেই রাসূল ﷺ তৎকালীন ও পরবর্তী সকল মূর্খ নারীদেরকে—খাদিজা রাঃ, আয়েশা রাঃ, ফাতিমা রাঃ—বোকা বানিয়েছেন। আর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণসহ যেসব বিদুষী নারী সাহাবীদেরকে আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত যাদের উপর সন্তুষ্ট বলে কুরআনে ঘোষণা করেছেন, সেসব নারী সাহাবীগণ রাসূল সাঃ-এর বানোয়াট কথাবার্তা নিজেদের মূর্খতাপ্রসূত কোন প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নিয়েছেন।

রোকেয়া নামা • পর্ব ৬

বেগম রোকেয়া বলেনঃ

ভগিনি, তোমরা দেখিতেছ এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরদিষ্ট নহে। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণীশাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকার কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? [5]

যে কথা পুরাকালে অসভ্য বর্বরগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের সুসভ্যগণ যদি বিশ্বাস করেন, তবে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় প্রভেদ কি? যাহা হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না। আরও দেখ যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক...যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষের সমতুল্যা। [6]

---

[5] রেফারেন্সঃ অলংকার না Badge of Slavery, রোকেয়া সমগ্র

[6] রেফারেন্সঃ অলংকার না Badge of Slavery, রোকেয়া সমগ্র

বেগম রোকেয়া এখানে প্রথমে সকল ধর্মীয় কিতাবকে অস্বীকার করেন। তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও সনাতন—এই চারটি প্রধান ধর্মকেই কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু এই চার ধর্মের প্রধান পয়গম্বরই এশিয়াতে আগমন করেন। আর একই সাথে তিনি "ঈশ্বরপ্রেরিত দূত" অর্থাৎ রাসূল সাঃ সহ পূর্বের সকল নবী-রাসূলদেরও ভণ্ড আখ্যায়িত করেছেন। এর ফলে শুধু কুরআনই নয়, বরং কুরআনের আগে নাযিলকৃত তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ সকল আসমানি কিতাবকেই তিনি অস্বীকার করেছেন।

পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড বলার পিছনে তার যুক্তি, মহান আল্লাহ তাআলা যদি সত্যিই নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠাতেন, তাহলে তারা কেবল এশিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকতো না। রোকেয়ার মতে, তাদের উচিত ছিল, আমেরিকা, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া। তার আরেকটি দাবি, পয়গম্বর বা নবী-রাসূলরা যদি নারী হতেন, তাহলে ধর্মীয় বিধি-বিধান এখনকার চাইতে ভিন্ন হতো। পুরুষ ছিলেন বলেই নারীদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বেগম রোকেয়ার আরও মন্তব্য করেন, নবী-রাসূলদের উপর প্রেরিত আসমানি কিতাব ও বিধানকে তৎকালীন অসভ্য-বর্বররা (অর্থাৎ প্রত্যেক নবী ও রাসূলদের স্ব স্ব সাহাবীগণ) মেনে নিয়েছেন। এখানে যেন কেউ এই ভুল সিদ্ধান্তে না আসেন যে, বেগম রোকেয়া বলতে চেয়েছেন, ইসলাম গ্রহণের আগে তারা অসভ্য, বর্বর ছিল। বরং তিনি বলেছেন, অসভ্য, বর্বর ছিল বলেই তারা সকল নবী-রাসূলদের নারী নির্যাতনকারী দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। সভ্য, আধুনিক হলে তারা নারী নির্যাতনকারী এসকল কথা বিশ্বাস করার মতো 'ভুল' করতো না। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এসে (ইউরোপিয়ান) আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া মানুষেরা সেসব বিশ্বাস করলে সভ্যতা আর অসভ্যতার পার্থক্য কোথায়?

এখানেই শেষ না। তিনি আরও দাবি করেন, যেখানেই ধর্মের বন্ধন দৃঢ়, সেখানেই নারীদের প্রতি নির্যাতন বেশী হয়। আর যে অঞ্চলে ধর্মবন্ধন শিথিল (খুব সম্ভবত ইউরোপ-আমেরিকার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন) সেখানে নারীরা ধর্মীয় অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।

রোকেয়া নামা • পর্ব ৭

বেগম রোকেয়া কি কাফির?

গত কয়েক পর্বে আমরা দেখেছি, বেগম রোকেয়া বেশ কয়েকভাবে ইসলামকে কটাক্ষ করেছেন—

এক. রাসূল সাঃ-কে মিথ্যুক, ভণ্ড ও স্বেচ্ছাচারী দাবি।

দুই. ঈসা আঃ-কেও একইভাবে সুচতুর মিথ্যুক দাবি।

তিন. সর্বোপরি, সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড ও মিথ্যুক দাবি।

চার. কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে, আল্লাহর বিধানসমূহকে মিথ্যা দাবি।

পাঁচ. পূর্বের সকল নবী এবং রাসূল সাঃ-এর সাহাবীদেরকে অসভ্য, বর্বর, বুদ্ধিহীন, মূর্খ বলে কটূক্তি।

ছয়. আদম আঃ ও হাওয়া আঃ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাকে অস্বীকার।

শুধু 'অলংকার না badge of slavery' প্রবন্ধই নয়, মাসিক 'নবনূর' পত্রিকায় ১৯০৪ সালের অক্টোবরে বেগম রোকেয়া 'অর্ধাঙ্গী' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। সেখানে তিনি বলেন,

মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্দ্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী

একজন নরের সমতুল্য।...আপনারা "মুহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে।...আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "অর্দ্ধেক" নই। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস!!...আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই।

অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় (আয়াতঃ ১১) বলেন,

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল।"

আয়াতের প্রথমাংশ খেয়াল করুন। সম্পত্তি বণ্টনে আল্লাহর এই বিধানকে বেগম রোকেয়া *"মুহম্মদীয় আইন"* বলে কটাক্ষ করেন। সম্পত্তির সঙ্গে ভালোবাসার অসম, বালখিল্য তুলনা দিয়ে এভাবেই তিনি আবারো রাসূল সাঃ-কে পরোক্ষভাবে পুরুষদের পক্ষপাতী ও নারীদের উপর অত্যাচারকারী বলে খোঁটা দেন।

অর্থাৎ, বেগম রোকেয়া ঈমানের মৌলিক রুকন (রিসালাত, কিতাব) অস্বীকার, শরিয়াহ বিধানকে কটাক্ষ সহ এমন কিছু মারাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছেন, যা মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে পুরোপুরি বের করে দেয়। রোকেয়ার পূর্বাপর সকল লেখাতে এসকল ভুল থেকে প্রকাশ্যে তওবার কোন চিহ্ন, ইঙ্গিতও নেই (বরং মৃত্যুর একবছর আগেও তিনি পর্দাকে বাজেভাবে কটূক্তি করে 'অবরোধ-বাসিনী' লিখে যান)। একদিকে ঈমান ভঙ্গের একাধিক কারণে জেনেবুঝে লিপ্ত হয়েছেন, অন্যদিকে তাকফিরের কোন প্রতিবন্ধকতাও তার গোটা জীবন জুড়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই, এটি সুস্পষ্ট যে, বেগম রোকেয়া নিঃসন্দেহে একজন কাফির। এতে আর দ্বিধান্বিত হবার কোন সুযোগ নেই।

রোকেয়া নামা • পর্ব ৮

বেগম রোকেয়া যে দুটি কাজ সারাজীবন নিষ্ঠার সাথে করেছেন, তার **একটি হল নারীদের জন্য পুরুষদের সমান শিক্ষার দাবি** (তা সে ধর্মীয় কিংবা ধর্মবিরোধী—যে শিক্ষাই হোক)।

আর অপরটি হল, **নারীদেরকে আল্লাহ নির্ধারিত পর্দার বাইরে যে কোন মূল্যে বের করে আনা।**

কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সীমাবদ্ধ করে যে বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে বিধানকে গোঁড়া থেকে উপড়ে না ফেললে, নারীরা ঘরের দায়িত্ব রেখে পুরুষদের সমান হওয়ার অযৌক্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তাই, স্বীয় এই লক্ষ্যে পৌছাতে তিনি তার গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করে দেন। পদে পদে কটূক্তি, নিন্দা, অবাস্তব সমালোচনা করেন ইসলামের পর্দাপ্রথা নিয়ে।

শুরুটা হয় সেই 'অলংকার না badge of slavery'তেই। সেখানে তিনি বলেনঃ

"প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলমাল বাধাইবে, জানি; মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" (অর্থাৎ প্রাণদণ্ড) এর বিধান দিবেন, এবং হিন্দু চিতানল বা তূষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি। কিন্তু জাগিতে হইবেই! বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও Galileu বলিয়াছিলেন, "but nevertheless it (Earth) does move"!! আমাদিগকে ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এ স্থলে পার্সী নারীদের একটী উদাহরণ দিতেছি।

নিম্নলিখিত প্যারা'টি এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনুবাদিত হইলঃ

"এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সীলেডীদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা যাহা, তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহার নামমাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দ্দায় অর্থাৎ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধীকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন !! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দ্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজি কালি পার্সী লেডীগণ পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন; খোলাগাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন; অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দ্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারি দিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানেরা বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল !" কই, পৃথিবীরত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও– সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের Equality বুঝিতে হইবে।"

ইরানী নারীদের জেগে উঠার উদাহরণ দিতে গিয়ে বেগম রোকেয়া এখানে বলেছেনঃ *“বিলাতি সভ্যতা’র প্রভাবেই ইরানী স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে পর্দা ছেড়ে বের করেন। এভাবেই পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার স্বাধীনতা পেয়ে ওরা ‘ভালো কাজের’ দিকে অগ্রসর হয়েছে। মুসলিম বাঙালি নারীরা এখনো কেন ইতস্তত করছেন? পর্দা ছাড়ুন, সময়ের চক্রে একসময় সবাই সব কিছু মেনে নিবে।*

উপরের এই উদ্ধৃতিটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেগম রোকেয়া তার পুরো জীবদ্দশায় অবরোধপ্রথা বা পর্দা নিয়ে যত সমালোচনা, কটূক্তি করেছেন, তার সার-নির্যাস এই পরিচ্ছেদ।

“এই লেখার মাধ্যমে রোকেয়ার পর্দা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বেশ সমালোচিত হন। এমনকি গিরিশচন্দ্র সেনের মতো হিন্দু লেখকরাও তার বিষাক্ত চিন্তার সমালোচনা করেন। তাই মাঝে কিছুদিন তিনি পর্দার বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ রাখেন। এমনকি বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ’বোরকা’ নামক প্রবন্ধে তিনি স্বীয় স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে পর্দার পক্ষে লেখার অসহ্য যাতনা পর্যন্ত নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হন!”

রোকেয়া নামা • পর্ব ৯

সমাজের চাপে পড়ে হয়তো দুয়েকবার পর্দার পক্ষে কথা বলা যায়। কিন্তু মনের রঙ তো আর চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'সুলতানার স্বপ্ন'তে রোকেয়া আবারো তার পর্দাবিদ্বেষ প্রকাশ করেন।

রোকেয়া তার কল্পকাহিনীতে চরিত্রের মুখ দিয়ে বের করলেন,

“জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা

অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। উড়িতে শিখিবার পুর্ব্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।”

এবার আসুন বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে আলোচিত বইয়ের দিকে এগোই। **১৯৩১ সালে প্রকাশিত ‘অবরোধ-বাসিনী’** বইটি মুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই চর্চার বাইরে থাকেনি। ‘আল্লাহ কোথায়! তাকে দেখতে পাই না কেন? প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ-খোদা মানি না’ সারাজীবন এই যিকির করা প্রত্যেক ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যায়ে এই বইয়ের প্রতিটি লাইনের উপর ঈমান আনেন। অথচ এই বইয়ের কাল্পনিক গল্পগুলোর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও প্রমাণ করতে পারেনি। ওই সময়েও পত্রপত্রিকায় অনেকে রোকেয়ার এরকম আকাশকুসুম মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন। ঘটনাগুলো যে বেগম রোকেয়ার রঙিন মনের গোপন কুঠুরিতে জন্ম নিয়েছে, সে কথা না বললেও চলে। যাক সে কথা।

অবরোধ–বাসিনী বইতে বেগম রোকেয়া পর্দা নিয়ে চরম ঘৃণ্য কিছু মন্তব্য করেন। [7]

যেমন ধরুন,

• যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ।

• একবার আমি কোন একটী লেডীজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোরকা দেখিলাম। একজনের বোরকা কিছু অদ্ভুত ধরণের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোরকা প্রশংসা করায়

---

[7] ১৯৩১ সালে প্রকাশিত ‘অবরোধ-বাসিনী’ বই

তিনি বলিলেন,—“আর বলিবেন না,—এই বোরকা লইয়া আমার যত লাঞ্ছনা হইয়াছে!” পরে তিনি সেই সব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এইঃ

▦ তিনি কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে (বোরকা সহ) দেখিবামাত্র সেখানকার ছেলে-মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কে কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাঁহার সকলের বাড়ীই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে বাড়ী গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চীৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। ছেলেরা ভয়ে থরথর কাঁপিত।

▦ তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে বোরকাসহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, “ওমা! ওগুলো কি গো?” একে অপরকে বলে “চুপ কর!-এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।” বাতাসে বোরকার নেকাব একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত— “দেখরে দেখ। ভূতগুলোর শুঁড় নড়ে—! বাবারে! পালা রে!”

▦ তিনি এক সময় দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে-বামনটা উচ্চতায় একটা ৭/৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োপ্রাপ্ত যুবকের,—মুখভরা দাড়ী গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে! দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকাধারিণীকে দেখিতে লাগিল!

▦ তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত। দুই একটা পার্ব্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার শুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে!

▦ কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিত,—“চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়,—ঐ!”-ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা!!”

জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি• এ• (আলীগড়) আজিমাবাদী নিম্নলিখিত ঘটনাত্রয় কোন উর্দ্দু কাগজে লিখিয়াছেন। আমি তাহা অনুবাদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথাঃ

গত বৎসর পর্য্যন্ত আমি আলীগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার ষ্টেশন একরূপ জাঁকজমকে ই· আই· আর· লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেই জন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের সময় ষ্টেশনে যাইতাম।

সেখানে অন্যান্য তামাসার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোরকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোরকাই কোন না কোন প্রকার কৌতুকাবহ ছিল।

সবার শেষে বেগম রোকেয়া তার জীবনের অন্যতম আফসোসটুকু দুটি লাইনে ফুটিয়ে তোলেন,

“কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে

কেন জন্ম লভিলাম পর্দ্দা-নশীন ঘরে!”

পর্দার প্রতি বেগম রোকেয়ার ঠিক এমনই বিদ্বেষ ছিল। নিজে তো পর্দাকে ‘মক্কা’, ‘মদিনা’, ‘জুজুবুড়ী’, ‘ভূত’ বলে কটাক্ষ করেছেনই, উপরন্তু অন্যান্য অমুসলিম, মডার্নিস্টদের পর্দা নিয়ে কটূক্তিকেও তিনি পর্দা ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে দেখিয়েছেন। একজন মুসলিম, তা সে যত পাপীই হোক না কেন, সে কাফির কিংবা মডার্নিস্ট মুরতাদদের ইসলামের বিধান নিয়ে এই ধরণের অবমাননাকর মন্তব্যকে প্রচার করবে, তাদের হাসিঠাট্টার কারণে পর্দা ত্যাগ করতে বলবে—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

বেগম রোকেয়া দাবি করতেন,

কেবল মাত্র মাত্রাতিরিক্ত—ইসলামের ফিকহী সীমানার বহির্ভূত কট্টর—পর্দার বাড়াবাড়ি কমিয়ে আনাই তার উদ্দেশ্য। অথচ বেগম রোকেয়ার উপরোক্ত মন্তব্যসমূহ, চাই তো তার পুরো রচনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করলে ইসলামে পুরুষ ও নারীর পর্দার শরিয়াহভিত্তিক নির্দেশনা সম্পর্কে গভীর ইল্ম রাখেন, এমন যে কারো চোখে স্বচ্ছ পানির মতো পরিষ্কার ধরা পড়বে যে—বেগম রোকেয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী পর্দাব্যবস্থার গোঁড়ায় কুঠারাঘাত করা।

রোকেয়া নামা • পর্ব ১০

বেগম রোকেয়া এমন এক অদ্ভুত মানুষ, যিনি আজ যাকে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যুক বলেন, কাল তাকেই নিজের কুযুক্তি প্রমাণের প্রয়োজনে পূজনীয় বানিয়ে দিতে পারেন। আবার আজ যে বিষয়কে জঘন্যতম বলে আখ্যায়িত করেন, কাল সে বিষয়কে অবশ্যকর্তব্য বলতে দ্বিধা করেন না। এ এক ভানুমতীর খেল! তার রচনাগুলোতে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে আপনিও তার এই মজাদার স্বভাবের রস আস্বাদন করতে পারবেন।

● প্রথমেই আসি সম্মানিত রাসূলদের ব্যাপারে। কারবালায় ইমাম হুসাইন রাঃ-এর শাহাদাতের ঘটনার করুণ বর্ণনা দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করা বেগম রোকেয়া কদিন পরই ‘অলংকার না badge of slavery’-তে কুরআন, রাসূল সাঃ, ঈসা আঃ—সবার বিরুদ্ধে নিজের সকল ঘৃণা ঢেলে দেন। ভয়ংকর সে কথাগুলো পড়ে কে বলবে, নবী-রাসূলদের মিথ্যুক, ভণ্ড বলে অপবাদ দেওয়া মানুষটাই কদিন আগে ইমাম হুসাইন রাঃ ও তার নাবালক সন্তানের করুণ শাহাদাতের অশ্রুসজল বর্ণনা করেছেন?

ঘটনা এখানেই শেষ না। যে রাসূল সাঃ-কে তিনি ভণ্ডনবী বলেন, যার প্রণীত শরিয়া বিধান মানায় নারী সাহাবীদের মূর্খ বলে কটাক্ষ করেছিলেন, ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে তিনি সেই রাসূলেরই দোহাই দিয়ে বলেন,

‘যদি ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) আপনাদের হিসাব নিকাশ লয়েন যে, *“তোমরা কন্যার প্রতি কিরুপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?” তবে আপনারা কি বলিবেন?... আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসিগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল, তখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন— কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।’*[৪]

---

[৪] রেফারেন্সঃ ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধ

১৯২৬ সালের মার্চে 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি'র সভানেত্রীর ভাষণেও তিনি রাসূল সাঃ-এর জন্য মানুষের আবেগকে ব্যবহার করতে বলেন,

"যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসূল মকবুল (অর্থাৎ পয়গাম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তের শত বৎসর পুর্ব্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে...এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?"

• হযরত ঈসা আঃ-কে সুচতুর ভণ্ড—যিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার অংশ দাবি করে নারীদের ধোঁকায় ফেলে—বলে অপমানিত করা বেগম রোকেয়া একটু পর তার উদ্ধৃতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

• স্ত্রীদেরকে অবহেলার সাজা হিসেবেই মুসলিমরা ভারতবর্ষে নির্যাতিত, এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে বেগম রোকেয়া বললেন,

'হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরুপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।"'

‘রানী ভিখারিনী’ প্রবন্ধেও তিনি বলেন,

‘এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে...হিন্দু শাস্ত্র বলে, “স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।” এর আমাদের রসূলুল্লাহ বলিয়াছেন, “তালাবুল ‘ইলমি ফরীজাতুন, আলা কুল্লি মুসলিমীন ওয়া মুসলিমাতিন” (অর্থাৎ সমভাবে(?) শিক্ষালাভ(?) করা সমস্ত মুসলিম, নর ও নারীর অবশ্যকর্তব্য)।’[9]

রোকেয়া নামা • পর্ব ১১

এবার চলুন 'অবরোধপ্রথা' বা বোরকা নিয়ে বেগম রোকেয়ার দ্বিচারিতার চিত্র দেখে আসি। তার বিভিন্ন রচনাকে পাশাপাশি রাখলে আপনি দেখতে পাবেন পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে ঠাসা সব লেখনী। কখনো অবরোধপ্রথাকে পূর্ণ সাপোর্ট দিয়েছেন, কখনো অবরোধপ্রথাকে মক্কা মদিনা, জুজুবুড়ী, ভূত বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি যে কি চাইতেন, আর কি চাইতেন না---সেটা বুঝে উঠাই বড় মুশকিল,

☑ | বোরকা— ‘আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই’।

☑ | বোরকা— অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কি উন্নতি হয়, তাহা আমরা তো বুঝি না।

---

[9] সমভাবে শিক্ষার কথা কখনোই ইসলামের কোথাও বলা হয়নি। আর রাসূল সাঃ ইলম শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শিক্ষা বলতে পশ্চিমা প্রভাবিত শিক্ষাও উদ্দেশ্য নয়। যে শিক্ষা নিলে লোকে ঈমানই ভঙ্গ করে ফেলে, সেই শিক্ষাকে রাসূল সাঃ ফরয বলে যাবেন, এ দাবি চরম মূর্খতার পরিচায়ক। বেগম রোকেয়া রাসূল সাঃ-এর হাদিসের মনগড়া অনুবাদ করে নিজের ইচ্ছামতো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন।

☑ | অর্দ্ধাঙ্গী— আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই।

☒ | অবরোধ-বাসিনী— আমরা বহু কাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের—বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, “পচা মাছের দুর্গন্ধ” ভাল না মন্দ?” সে কি উত্তর দিবে?

☑ | বোরকা— কেহ বলিয়াছেন যে,

“সুন্দর দেহকে বোরকা জাতীয় এক কদর্য্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভুতকিমাকার জীব সাজা যে কী হাস্যকর ব্যাপার যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন”- ইত্যাদি।

...কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং

ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই।

বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখাইয়া সাধারণ দর্শকমন্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবেন।

☒ | অবরোধ-বাসিনী— জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি. এ. (আলীগড়) আজিমাবাদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বেগম রোকেয়া বলেন,

“গত বৎসর পর্য্যন্ত আমি আলীগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার ষ্টেশন বিশেষ এরুূপ জাঁকজমকে ই. আই. আর. লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেই জন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের জন্য স্টেশনে যাইতাম। সেখানে অন্যান্য তামাসার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ

শতাব্দীর বোরকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলার, প্রত্যেক বোরকাই কোন না কোন প্রকার কৌতুকাবহ ছিল।"

☑ | বোরকা— সকল সভ্যজাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি ‘জঘন্য’ বলেন, তাহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

☒ | অবরোধ-বাসিনী— তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে বোরকাসহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, “ওমা! ওগুলো কি গো?” একে অপরকে বলে “চুপ কর!-এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।” বাতাসে বোরকার নেকাব একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত— “দেখরে দেখ। ভূতগুলোর শুঁড় নড়ে—! বাবারে! পালা রে!”

◍ কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিত,—“চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়,—ঐ!”-ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা!!”

বুঝতেই পারছেন, বেগম রোকেয়া কিরকম 'সুচতুর' বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। এমন একজন মানুষের প্রতিটা কথা যারা বেদবাক্যের মতো গ্রহণ করে নেয়, সেই ফেমিনিস্ট, হিজাবি ফেমিনিস্টদের ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা কীভাবে আশা করা যায়?

রোকেয়া নামা • পর্ব ১২

বেগম রোকেয়ার বিশ্বাস ও কাজে ইউরোপের প্রভাবঃ

বেগম রোকেয়ার এই যে এতোসব বিপ্লবী চিন্তামালা, সেসব কিছু তার উর্বর মস্তিষ্কে আসমানি ওহী হিসেবেও নাযিল হয়নি, কিংবা জিবরীল আঃ-এর মতো কোন দূতও তার কাছে সেসব পৌঁছে দেননি। তাহলে বেগম রোকেয়ার এরকম ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাভাবনার পিছনে দায়ী কে**?**

শুরুতেই বলেছিলাম, বেগম রোকেয়ার স্বামী, খানবাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ইউরোপ থেকে পড়াশোনা করে আসার পর বেগম রোকেয়াকে বিয়ে করেন। তার তত্ত্বাবধানেই রোকেয়া ইসলামের বিপরীতে ইউরোপের ক্রমবর্ধমান ধর্মহীন বিশ্বাসের দীক্ষা পান।

বেগম রোকেয়ার সকল অপকর্মের আগুনে বাতাস দেওয়া প্রধান কালপ্রিট যে সাখাওয়াত হোসেন, এ কথা বলার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। স্বামীর জীবদ্দশায় বেগম রোকেয়ার নবী-রাসূলগণ কিংবা পর্দাকে কটাক্ষ করা যে তার দৃষ্টির আড়ালে হয়েছে—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া, ইউরোপ ফেরত স্বামী ছাড়া ইউরোপীয় দর্শনের এতো গভীর স্পর্শ বেগম রোকেয়া আর কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। হ্যাঁ, ভাইয়ের কাছে অল্পবিস্তর পশ্চিমা দর্শন তিনি শিখেছেন। তবে, তা স্বামীর মতো এতটা গভীর প্রভাব ফেলেনি। বরং, বেগম রোকেয়া নিজেই তার ফেমিনিস্ট লেখার ব্যাপারে সাখাওয়াত হোসেনের প্রশংসার কথা লিখে গেছেন।

রোকেয়া তার স্বামী জীবিত থাকাকালীন ‘মতিচূর’, ‘সুলতানার স্বপ্ন’ এবং ‘পদ্মরাগ’ লেখা সম্পন্ন করেন। **প্রবল পুরুষবিদ্বেষী ‘সুলতানার স্বপ্ন’ দেখে সাখাওয়াত হোসেন মন্তব্য করেছিলেন, “A Terrible Revenge.” (ভয়ংকর প্রতিশোধ)!**

এছাড়াও তার ভাই ইবরাহীমও একই দোষে দুষ্ট। ‘পদ্মরাগ’ বইয়ের ‘নিবেদন’ পাতায় বেগম রোকেয়া তার ভাইয়ের বিশ্বাসের ব্যাপারে লিখেন, ইবরাহিম ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন, মুসলিম, হিন্দুসহ সকল ধর্মের অনুসারীরা ধর্মের দ্বিতীয় নিচু তলার বাসিন্দা। এই তলায় কোন ভেদাভেদ নেই, হিন্দু, মুসলিম সবাই সমমর্যাদার অধিকারী। তার উপরের তলার বাসিন্দা হল ‘মানুষ’। এখানে কোন ধর্মের অনুসারীর স্থান নেই।

এই যে ‘মানুষ’ বা ‘Humanism’ দর্শন, এর শিক্ষা ইবরাহীম কোথায় পেলো? নিশ্চয়ই বাংলার কোন পীর বা আলেম-মোল্লা তাকে এসব শেখায়নি। এসবের শিক্ষা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ছাড়া আর কোথায় পাবেন তিনি?

বেগম রোকেয়ার নিজের লেখাতেও তার ইউরোপ-প্রেমের বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ প্রবন্ধে রোকেয়া বলেন, *“আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে। তবু মনে হয় যে, পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না।”*

খুব ভালো করে বাক্য দুটি খেয়াল করুন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্থানে আদম আঃ ও তার স্ত্রী হাওয়া আঃ-এর সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেছেন। এমনকি হাদিসেও এ সম্পর্কে প্রচুর বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ, মুসলিমদের এটা বিশ্বাস করা অপরিহার্য যে, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধে আদম আঃ ও হাওয়া আঃ-কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবেই পৃথিবীতে মানুষের আগমন।

অন্যদিকে, পশ্চিমা এনলাইটেনমেন্টের পরবর্তী দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের সে ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে। তারা এসব বিশ্বাসকে কুসংস্কার হিসেবে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়। সেই পশ্চিমা দর্শনের দেশীয় চিত্র আমরা রোকেয়ার লেখায় দেখতে পাই। আদিমকালে মানুষ সভ্য ছিল না, বেগম রোকেয়া এই দর্শন কোথায় শিখলেন?

'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধের দ্বিতীয় ফুটনোটে জাপানের নারীদের ব্যাপারে রোকেয়া লিখেন,

'যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে এখন ইউরোপীয় রীতি নীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ রমণীর অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।' অর্থাৎ, ইউরোপই ছিল বেগম রোকেয়ার কাছে উন্নতির সর্বোত্তম মানদণ্ড।

একই প্রবন্ধে তিনি আবারো দাবি করেন, "জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন।"

বেগম রোকেয়া এখানে কোন জাতির কথা বলেছেন, বলতে পারেন? বিশ্বের বুকে তখন উন্নতির চূড়ায় কারা ছিল? রোকেয়ার 'আশা-জ্যাতি' প্রবন্ধ থেকেই উত্তরটা দিই। সেখানে তিনি বলেন,

"আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধনাঢ্য এবং সর্ববিষয়ে উন্নত; কেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৃপায়।"

বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ' নামক এক প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া অনুবাদ করেন। সেখানে আফগানিস্তানের সাবেক শাসক আমানুল্লাহ খাঁ-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। প্রবন্ধটির লেখিকা ফাতেমা আমানুল্লাহ খাঁ-র কন্যাদের ব্যাপারে বলেন,

“রাজকুমারীরা অতিশয় সুন্দরী; তাহাদের পোশাক একেবারে আজকালকার ইউরোপীয় ধরণের, এবং সকলেরই আধুনিক(!) ধরণের চুল কাটা, এমনকি, বেগম তরজী সাহেবারও চুল কাটা এবং পোশাক একেবারে ইউরোপীয় ধরণের।”

এই বেগম তরজী সাহেবা হলেন বাদশা আমানুল্লাহ খাঁ-এর শাশুড়ি। এই মহান পরিবার ইউরোপীয়দের চকচকে সংস্কৃতি দেখে এতোটাই প্রভাবিত হয় যে, বাদশাহর কন্যারা তো বটেই, তার শাশুড়ি-ও ইউরোপীয় স্টাইলে চুল কেটে ফেলেন, মুসলিম নারীদের পোশাক ছেড়ে ইউরোপীয় খোলামেলা পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে নেন।

বাদশা আমানুল্লাহ খাঁ-র ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার এতো শ্রদ্ধা ছিল, কারণ তিনি আফগানিস্তানে ইউরোপীয় ‘নারী শিক্ষা’র প্রচার শুরু করেছিলেন। আমানুল্লাহ খাঁ-কে তার সিংহাসন থেকে উৎখাত করার কারণে বেগম রোকেয়া আফগান বাসিন্দাদের ‘বদবখত’ ও ‘ছেয়াহ্ বখ্‌ত’, ‘অভিশপ্ত জাতি’ বলে নিন্দা জানান।

কিন্তু, আমানুল্লাহ খাঁ কি আসলেই ‘পুণ্যশ্লোক’, ‘প্রকৃত মুসলমান পুণ্যাত্মা’, ‘মহাত্মা’ বাদশাহ ছিলেন, যেমনটা বেগম রোকেয়া বলেছেন? আফগান আলেমরা কি আসলেই তাকে অন্যায় কাজ করার অনুমতি না দেয়ার ‘অপরাধে’ কাফের বলেছেন? এ কেমন অবিচার? পৃথিবীর সব দেশে, সব জনপদেই কি আলেমরা শুধু ঝামেলাই পাকায়?

আমানুল্লাহ খাঁ যে শিক্ষা আফগানিস্তানে চালু করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল সরাসরি ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা। এটা সেই শিক্ষাব্যবস্থা, যার ভিত্তি ছিল ধর্মহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত । আমানুল্লাহ খাঁ কাবুলের

নারীদের পর্দা না করার অনুমতি প্রদান করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের ইসলামী ড্রেস কোড বাদ দিয়ে ইউরোপীয় ড্রেস পরার জন্য উৎসাহিত করেন। **এছাড়াও ইসলামী শরিয়াহ-তে নারী ও পুরুষের যৌক্তিক যে পার্থক্য রয়েছে, পশ্চিমা দর্শনে প্রভাবিত হয়ে তিনি সেসব পার্থক্য মুছে নারী-পুরুষ 'সমতা' তৈরির উদ্যগও নেন, যার আধুনিক রূপ আজ আপনি 'জেন্ডার থিওরি' হিসেবে দেখতে পান।**

এই জেন্ডার থিওরি পুরোটাই পশ্চিমা দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের সাথে এর ব্যবধান আকাশ আর পাতাল। **কেউ যদি পশ্চিমা দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম নারী-পুরুষের বায়োলজি, সাইকোলজি, ফিজিওলজির পার্থক্যের কারণে যে স্বাভাবিক ভিন্নতার অনুমোদন দিয়েছে, সেগুলো অস্বীকার করে, তাহলে তো তার ঈমানই থাকবে না।**

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন পুরো মাত্রায় পশ্চিমা প্রভাবিত, যার কাছে পশ্চিমের সবই রঙিন, ইসলামের সব কিছুই ফিকে। আফগানিস্তানকে তিনি ইসলামী সংস্কৃতি ছেড়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। এমনি এমনি বাদশাহ-কে কাফের বলা হয়নি। আর এসবই ছিল বেগম রোকেয়ার চোখে আমানুল্লাহ খাঁ-র পুণ্যাত্মা হওয়ার রহস্য।

রোকেয়ার চিন্তাভাবনা যে সরাসরি ব্রিটিশ এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, এটি খুব সুন্দর করে বোঝা যায় এক ব্রিটিশ অফিসারের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার মন্তব্যে। বোরকা প্রবন্ধের সর্বশেষ ফুটনোটে রোকেয়া বলেন,

"এই সন্দর্ভটি লিখিত হইবার পর বর্তমান ছোটলাট Sir Andrew Fraser "The Purdah of Ignorance"শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলেছেন—

“Let the efforts of educationists be first directed to the instruction of our girls within the purdah, and let women begin to exercise her chastening influence on society in spite of the system of seclusion, which only time can modify and violent efforts to shake which can only arouse opposition to female education, instead of doing any immediate practical good in the direction, of emancipation of women.”[10]

আমাদের মতের সহিত ছোটলাট বাহাদুরের মতের কি আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়!”

অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ অনেকটা এরকম,

“শিক্ষাবিদদের চেষ্টাগুলো প্রথমে পর্দার ভেতরে থাকা মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রতিই পরিচালিত হোক। আর নারীরা (ফ্রি মিক্সিং থেকে) স্বতন্ত্র (বা পৃথক) থেকেই সমাজে তাদের অবদমিত প্রভাবের চর্চা আরম্ভ করতে থাকুক। (পুরুষদের থেকে) নারীদের এই পৃথক থাকার সিস্টেম সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে আসবে। (ইসলামে নারী-পুরুষের এই) পৃথক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার যে কোন জবরদস্তিমূলক চেষ্টা (ইসলামী শরিয়াহ, সমাজ ব্যবস্থার হাত থেকে) নারীদের উদ্ধার করার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার বদলে বরং (জনগণের মাঝে) নারীদের (পশ্চিমা) শিক্ষার বিরোধিতা আরও বাড়িয়ে তুলবে।”

---

[10] গত ৮ মার্চের “Telegraph” সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত।

এই কয়টা লাইনে বেগম রোকেয়ার শিক্ষা আন্দোলনের দর্শন পানির মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ কর্মকর্তা কিংবা রোকেয়া—

সকলেই এটা বুঝতে পেরেছিল, শুরুতে পর্দাব্যবস্থা ভাঙার প্রচেষ্টা হিতে বিপরীত হবে। নারীদেরকে প্রথমে পশ্চিমা শিক্ষা দেওয়া হোক, তাহলে সময়ের সাথে সাথে এমনিতেই পর্দাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে। আফসোসের বিষয় এই যে, ওরা সেটা বুঝতে পারলেও, আমাদের কোন মুসলিম ভাই কিংবা বোনকে যদি আপনি এ কথা বলেন, তাহলে সে তেলে–বেগুনে জ্বলে উঠে আপনাকেই ইসলামবিদ্বেষী ট্যাগ দিয়ে বসবে।

এই সিদ্ধান্তে আসার আরও কারণ আছে। রোকেয়া নিজেই রাসূল, কুরআন, ইসলামী আইন (শরিয়াহ), পর্দাব্যবস্থা, ফিকহে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু, নিজে কোনদিন পর্দা ত্যাগ করেননি। আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, করতে পারেননি। কারণ, তিনি বোরকা না পড়লে তার স্কুলে রক্ষণশীল অভিভাবকরা নিজেদের মেয়েদের পড়াশোনা করতে পাঠাতো না, এ আশংকা তার ছিল। এ কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন।

রোকেয়া নামা • পর্ব ১৩

“বেগম রোকেয়ার উত্থানের পূর্বে মুসলিম-বাঙালি নারীরা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। শুধু নারীগণ নয়, বরং গোটা মুসলিম সমাজই অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর (১৮০০-১৮৯৯) শেষাংশ থেকে শুরু হয়েছিল মুসলিমদের নবজাগরণ। আর মুসলিম নারীদের বহুল প্রতীক্ষিত জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।”

স্কুলে গিয়েছেন, অথচ এই অংশটুকু কখনো পড়েননি কিংবা শোনেননি, *এমন মানুষ হয়তো খুবই নগণ্য। আপনি, আপনার বোন-বান্ধবী-ভাগনে, প্রায় প্রত্যেকেই সেই ছোটবেলা থেকে এই একই বয়ান শুনে বড় হয়েছেন, শুনতে শুনতে এই বয়ান ওহীর মতো*

বিশ্বাসও করে ফেলেছেন—এমনটা দাবি করলে খুব ভুল বলা হবে না আশা করি। কিন্তু, এই দাবির আদৌ কতটা সত্য, আর কতটা মিথ্যা, সে বিষয়ে কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছেন? কিংবা জানার চেষ্টা করেছেন?

শিক্ষা নিয়ে বেগম রোকেয়ার প্রচুর বক্তব্য রয়েছে। প্রায়ই তিনি মুসলিমবঙ্গের মানুষদের সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসেবে মুসলিম নারীদের শিক্ষার অভাবকে দায়ী করতেন। স্কুল কলেজে এই কথা তোতাপাখির মতো শিখার ফলে আজকাল মুসলিমরাও রোকেয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে দাবি করেন, তার আমলে এই বাংলায় নারীদের অধিকার বলতে কিছু ছিল না। তারা পড়ালেখা করতে পারতো না, তাদের জন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না, সম্পত্তিতে তাদের ভাগ ছিল না। তারা আপনাকে বলে, ব্রিটিশদের কাছ থেকে নারী অধিকারের দীক্ষা পাওয়া বেগম রোকেয়াই মুসলিমবঙ্গের নারীদের প্রথম অধিকারের দাবি জোর গলায় বলতে শিখিয়েছে।

তাদের সকল কথার সারমর্ম দাঁড়ায়,

১. ইসলামে নারীদের যথাযথ অধিকার দেয়া হয়নি (এ কথাটা

সরাসরি শেখানো হয়না, কারণ এ কথা সরাসরি বললে ফেমিনিজম বা নারীবাদের নামে নারীদের মাঝে পশ্চিমা দর্শন প্রচার করতে পারবে না)।

২. যথাযথ অধিকার না দিলেও, যেটুকু দিয়েছে, তৎকালীন মুসলিম বাঙালিরা সেটুকুও নারীদের দিতেন না (বেগম রোকেয়া থেকে পরবর্তী অধিকাংশ হিজাবি ফেমিনিস্টরা এই কথাটা প্রায়ই বলে থাকে)।

৩. নারীদের অধিকার দেওয়ার প্রকৃত শিক্ষা আমরা পেয়েছি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, ব্রিটিশ ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের কাছ থেকে।

৪. সকল কথার মূল কথা, নারীদের অধিকার, স্বাধীনতা, মুক্তি এসব কিছুই পশ্চিমারা মুসলমানদেরকে শিখিয়েছে। পশ্চিমারাই নারীদের প্রকৃত সম্মান দিয়েছে। নারীদের অধিকার রক্ষায় আইন করেছে।

প্রিয় ভাই/বোন, আপনি দেখতে পাবেন, এই যে উপরে কিছু কথা বলা হয়েছে, স্কুল-কলেজ, শিক্ষা-সাহিত্য, মিডিয়া-নাটক-সিনেমা, অফলাইন-অনলাইন সবখানে এই বয়ানগুলোই আপনি দেখতে পাবেন। কিন্তু, কখনো কি আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই যে কথাগুলো কেন মুমিন নারী ও শিশুদের শেখানো হয়, এগুলো কি আসলেই কোন ঐতিহাসিক সত্যতা রাখে?

চলুন, ইতিহাসের উঠোনে একবার চক্কর মেরে আসি।

পুরনো দিনের কথা, হয়তো পড়তে একটু কঠিন লাগতে পারে। তবে একটু মনোযোগ দিয়ে লেখাটুকু পড়লে তাদের এসকল দাবির ব্যাপারে আপনার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমি তিনটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো,

১. ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও তার সুফল কেমন ছিল

২. ব্রিটিশরা আসার পর বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে ধ্বংস হয়

৩. ব্রিটিশরা মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সহায়তায় যে নতুন ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করে, ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে আজ অবধি মুসলিম বাঙ্গালিদের মধ্যে তার প্রভাব।

তাহলে শুরু করা যাক, কি বলেন?

ক. মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে চাইলে আপনাকে চলে যেতে হবে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে, যখন জিবরীল আঃ মুহাম্মাদ সাঃ-এর কাছে কুরআনের পাঁচটি আয়াত নিয়ে সর্বপ্রথম অবতরণ করেছিলেন। রাসূল সাঃ-এর শোনা কুরআনের প্রথম শব্দটি ছিল, 'ইক্বরা!' বা 'পড়ো'। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত শিক্ষার মাধ্যমে তৎকালীন সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমদের জন্য এই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, পড়ার কোন বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে ইল্ম শব্দটি প্রায় ৮০০ বারের মতো এসেছে। আর এই ইল্ম বলতে শুধু এমন কিছু তথ্য বোঝায় না, যা কেবলই একজন থেকে অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। বরং এই ইল্ম মানুষকে তার স্রষ্টার সঙ্গে সংযোগ ঘটায়, মানুষকে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানায়, আর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করতে সহায়তা করে।

খ. মুসলিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইসলামী শিক্ষার সূচনা হয় দিল্লি সালতানাতের সময়ে। তবে শুরুটা ছিল আরও আগে, যখন সুফি-সাধকরা বাংলার মাটিতে আগমন করেন । সুফিরা যে অঞ্চলে যেতেন, সেখানে 'খানকা' প্রতিষ্ঠা করে তাতে ইবাদত-বন্দেগি করতেন। আর সেখানেই দলে দলে লোকেরা আসতেন তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই খানকাগুলো প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছিল, তারা সুফি ওস্তাদদের কাছ থেকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

গ. সময়ের চক্রে একসময় খানকাগুলো প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রেও পরিণত হয়, যেগুলোকে বলা হত মক্তব। শুধু খানকাই নয়, মসজিদ কিংবা স্বচ্ছল মুসলিমদের বাড়িতেও মক্তবের প্রতিষ্ঠা হওয়া আরম্ভ হয়। মক্তব আর মাদ্রাসাগুলো সাধারণ জনগণের অর্থায়নেই

পরিচালিত হতে থাকে। তবে এই দৃশ্য বদলে যায়, যখন **ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১১৯৭ সালে বঙ্গভূমিতে মুসলিম বিজয়ের সূচনা করেন ।** এরপর থেকে বাংলার মুসলিম শাসকগণ শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে আরম্ভ করেন।

ঘ. ইউরোপীয় শক্তির আগ্রাসনের আগে, গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়ে অনেকগুলো শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মুসলিমবঙ্গ-ও তার ব্যাতিক্রম ছিল না। সেই শিক্ষাব্যবস্থাগুলোর ভিত্তি ছিল ইসলামিক আকিদা ও দর্শন। আল্লাহর এককত্ত্ব (তাওহীদ), রাসূল সাঃ-এর শিক্ষা (নবুওয়ত) এবং মৃত্যুর পরের জীবন (আখিরাত)– এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা ও সেখানে শিক্ষাদানের কাঠামো গঠনে ভূমিকা রাখে।

ঙ. এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সেই সময়ে মুসলিমবঙ্গের মাদ্রাসায় কি পড়ানো হতো। তখনকার মাদ্রাসার কারিকুলাম কি এখনকার মাদ্রাসাগুলোর মতো কেবলই আলিম তৈরির একক ও মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করতো? **এর উত্তরঃ না।**

সেকুলাররা শিক্ষাকে যেভাবে অন্যান্য শিক্ষা এবং ধর্ম–এই দুই ভাগে ভাগ করে, মুসলিমদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন কোন বিভক্তি ছিল না। মুসলিম সভ্যতায় মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম উলুম আল-মাক্কুল (যুক্তিলব্ধ জ্ঞান) এবং উলুম আল-মানক্কুল (প্রেরিত জ্ঞান)–এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। দর্শন, অঙ্ক, পদার্থ, রসায়ন, মেডিসিন সহ অন্যান্য যেসকল বিষয়াদি আজ 'সেকুলার' হিসেবে গণ্য হয়, তৎকালীন মুসলিম সমাজে সেগুলো উলুম আল-

মাক্কুল-এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতো। আর, বর্তমানে এই বিষয়গুলোর মূল সেকুলার বা ধর্মহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, তৎকালীন সময়ে বাংলায় তথা মুসলিম বিশ্বে এই সাবজেক্টগুলো ইসলামিক বিশ্বদর্শন অনুযায়ী পড়ানো হতো।সেই সঙ্গে উলুম আল-মাক্কুল অর্থাৎ লজিক, পদার্থ, মেডিসিন, বীজগণিত, আলোকবিদ্যা, পাটীগণিত, জ্যামিতি , জ্যাতির্বিদ্যা, ইত্যাদি সাবজেক্টগুলো ধর্মীয় শিক্ষার এক একটি শাখা হিসেবেই বিবেচিত হতো । মুসলিম চিন্তাবিদরা সাইন্টিফিক রিসার্চকে ধর্মীয় জ্ঞানসমূহের বিশাল সমুদ্রে অবগাহনের একটি উপায় বলে মনে করতেন ।

চ. ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে এই ছিল মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র। ব্রিটিশরা যখন এ দেশের ক্ষমতা দখল করে নেয়, তখন তারা দেখতে পায়, ১৭৬৫ সালে বাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসার সংখ্যা মোট আশি হাজার। এই আশি হাজার মক্তব-মাদ্রাসা ও খানকার জন্য গোটা বাংলার চারভাগের একভাগ জমি লাখেরাজ (নিষ্কর) হিসেবে বরাদ্দ ছিল। সেই জমির আয় দিয়েই মক্তব মাদ্রাসাগুলো দিব্যি চলে যেতো ।

অর্থাৎ, ব্রিটিশদের পলাশী বিজয়ের আগের মুসলিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এখনকার চাইতেও আধুনিক। মক্তব মাদ্রাসার সেই শিক্ষিত মানুষগুলো তৎকালীন বাংলার বাণিজ্য পরিচালনা করতেন, রাজকার্যে সহায়তা করতেন। আর সেই মাদ্রাসায় পড়া মোল্লারাই তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে করে তুলেছিল পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। বাংলার মশলা, শিল্পজাত পণ্য, মসলিন রপ্তানি হতো পুরো পৃথিবীতে। সে ইতিহাস তো আপনার জানা থাকার কথা। তাই এ কথা বললে ভুল হবে না যে, মুসলিমবঙ্গের স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে আজকের একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থাও ডাহা ফেইল মারবে।